بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৩৮। www.motaher21.net

وَلَا تَمُوتُنَّ

" মরো না! "

" Die not !"

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না।

আয়াতের তাফসীর:

অধিকাংশ মুফাসসির বলেন,

(يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ)

আয়াতটি

اِتَّقُو اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ

'তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর' দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, حق تقاته এর তাফসীর হল

مااستطعتم

যথাসম্ভব আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। (আযউয়াউল বায়ান, ১/২২১)

এ আয়াতকে মানসুখ মনে না করে পরবর্তী আয়াত তার ব্যাখ্যাকারী মনে করাই শ্রেয়। কারণ মানসুখ তখনই ধরে নেয়া যেত যদি উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য সাধন করা না যেত। তাই এর অর্থ হবে

(اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم)

আল্লাহ তা'আলাকে ঐভাবে ভয় কর, যেভাবে স্বীয় সাধ্যমত তাঁকে ভয় করা উচিত। (ফাতহুল কাদীর, ১/৪৯৫)

(وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ)

অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক যাতে মৃত্যু ইসলামের উপরেই হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের প্রত্যেকে যেন আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভাল ধারণা নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। (মুসনাদ আহমাদ হা: ১৪১২৫, সহীহ)

(وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا)

আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার কথা বলার পর তার রশি সকলকে শক্তভাবে ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ কথা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দু'টি মূলনীতিতে মুক্তি নিহিত: ১. আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা। ২. সকলে দীনের ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকা। হাবলুল্লাহ হল পবিত্র কুরআন ও দীন ইসলাম। যদিও এছাড়া অনেক তাফসীর পাওয়া যায়। তবে এটাই সঠিক। (আয়সারুত তাফসীর ১/২৯৪)

[১] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অর্জনের হক্ক আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক। কিন্তু তাকওয়ার হক বা যথার্থ তাকওয়া কি? আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ, রবী, কাতাদাহ ও হাসান রাহিমাহুমুল্লাহ বলেন, তাকওয়ার হক হল, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য

করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা- কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা- অকৃতজ্ঞ না হওয়া। [ইবন কাসীর]

তাকওয়াঃ- لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ '' এর تقو তাকওয়া শব্দের মুল ধাতু وقي এর অর্থ বাঁচা। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো ভয় করা। পারিভার্ষিক অর্থ হলো:- ''আল্লাহ ও তার রাসুলের সকল আদেশ মানা নিষিদ্ধ কাজ থেকে দুরে থাকা।''

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করতে হবে, তার আদেশ নিষেধ মানতে হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। সকল ফরজ, ওয়াজিব পালন করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে তাকওয়া।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন: ''তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তার নাফরমানী না করা, আল্লাহকে স্মরন করা, তাকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও তার কুফরী না করা।''

তাকওয়ার ব্যাপারে অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে। কিছু লোক আছে যারা ইসলামের ফরজ ওয়াজিব এবং হারাম কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল নন, তারা বিশেষ কিছু সুন্নত ও নফল কাজ করে নিজেদেরকে মোত্তাকী এবং মোত্তাকী নয় বলে মনে করে । তারা হাতে তাসবীহ, মাথায় টুপি- পাগড়ী, মুখে লম্বা দাঁড়ি, গায়ে লম্বা জামা এবং পেশাব পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার করাকে তাকওয়ার মাপকাঠি মনে করে। অথচ এগুলো সুন্নত ও মোস্তাহাবের বেশী কিছু নয়। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক. অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অগনিত ফরজ ওয়াজিব রয়েছে যেগুলো তারা পালন করে না এবং সেগুলোর খবরও রাখেনা । যেমন পর্দাহীনতা, সুদ, ঘুষ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ, দাওয়াতে দ্বীন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে তারা উদাসীন। পক্ষান্তরে, যারা এসব কাজ করেন এবং সেজন্য জান- মাল উৎসর্গ করেন তাদেরকে তারা মোত্তাকী বলতে নারাজ। অথচ তারাই সত্যিকার অর্থে মোত্তাকী। তারাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিতে জানমালের সর্বাতœক কোরবানী করে তাকওয়ার চুড়ান্ত পরাকাষ্ঠ দেখান। তারা বিজয়ী গাজী কিংবা শহীদ হন। তারাই যদি মোত্তাকী না হয় তাহলে যারা এত সস্তা আমল করে এবং কঠিন আমল থেকে দুরে থেকে তারা মোত্তাকী হন কোন যুক্তিতে? তাকওয়াতে শুধুমাত্র কিছু সুন্নাত ও সীমিত ফরজ কাজ আদায়ের নাম নয়। মোত্তাকী হতে হলে ব্যাক্তিগত, পারিবারিক. সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক নীতি সহ শিক্ষা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ জানতে হবে ও মানতে হবে ।

এক ধরনের ভন্ড পীর- ফকির ও দরবেশ আছে যারা বহু অনৈসলামী কাজ করে নিজেদেরকে মোক্তাকী এবং আল্লাহর প্রেমিক বলে দাবী করে। তাদের হাতে তাসবীহ ও লাঠি, মুখে গাজা ও দাঁড়ি এবং পরনে বিভিন্ন ধরনের কাপড় থাকে। কবর পূজা তাদের প্রধান কাজ। এগুলো তাকওয়াতো দুরের কথা বরং তার থেকে

অনেক অনেক দুরের জিনিস। কেননা তাকওয়ার অর্থ হল আসল ফরজ ওয়াজিব মানা এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে তারা হারাম কাজ সব করে এবং ফরজ ওয়াজিব থেকে দূরে থাকে। এরা দোজখের ইন্ধন ছাড়া আর কি? দ্বিতীয় খলিফা, ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উবাই (রাঃ) বলেন : আপনি কি কাঁটা যুক্ত পথে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বলেন 'হ্যা। উবাই (রাঃ) বলেন, কিভাবে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বলেন গায়ে যেন কাঁটা না লাগে সে জন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্ক ভাবে চলেছি। উবাই (রাঃ) বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহারন।

অর্থাৎ সমাজে, জীবনে চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপ এমন সাবধানে চলা যাতে কোন পদক্ষেপই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের (স:) এর বিরোধী না হয়। এখানে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের বিরোধী কাজকে পথের কাঁটা হিসাবে উদাহারন দেয়া হয়েছে। কাঁটাযুক্ত পথে যেভাবে সতর্কতার সাথে কাঁটা এড়িয়ে চলতে হয় ঠিক সেভাবেই আল্লাহ এবং তার রাসুল (সঃ) এর বিরোধী প্রতিটি কাজকর্ম প্রতি মূহুর্তে সাবধানে পরিত্যাগ করতে হবে। তাহলেই তাকওয়া অর্জিত হবে। নিম্মোক্ত আয়াতে আল্লাহ সকল যুগের মানুষদেরকেই তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন–

و لقد وصبنا الذين اوتو الكتا من قبلكم واياكم ان التقو الله (النساء-১৩১)

"আমি তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবদের এই উপদেশ দিয়েছিলাম আর যখন তোমাদেরকেও উপদেশ দিতেছি যে, তাকওয়া অবলম্বন করা।

(সুরা–৪, নিসা–১৩১)

* তাকওয়ার ফায়দা কি?

তাকওয়া অবলম্বনের ফলে এই দুনিয়া তথা ইহকালে ১৫ (পনের)টি ফায়দা লাভ করা যায়ঃ–

(১) তাকওয়ার ফলে মানুষের জটিল বিষয়গুলো সহজ হয়ে যায়।

و من يتق الله يجعله من امره يسرا (الطلاق-৪)

" আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করলে আল্লাহ বান্দার বিভিন্ন বিষয়গুলো সহজ করে দেবেন।

(সুরা-৬৫, তালাক-৪

(২) তাকওয়ার ফলে মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে ঃ

(الاعراف ٢٠١) إن الذين التقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون

"যারা তাকওয়া অনুসরণ করে, শয়তানতাদেরকে ক্ষতি করার জন্য স্পর্শ করলে তারা সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরন করে। তখন তারা তাদের জন্য সঠিক ও কল্যাণকর পথ সুপষ্ঠভাবে দেখতে পায়। (সুরা-৭, আরাফ-২০১)

(৩) তাকওয়ার ফলে আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা খুলে যায়ঃ

(الاعراف-٩٦) ولو ان اهل القري امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الرض

" জনপদবাসীরা ঈমান ও তাকওয়ার অনুসরণ করলে, আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকত সমূহ উন্মুক্ত করে দেব।

(সুরা-৭, আরাফ-৯৬)

(৪) হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার তাওফিক লাভ করেঃ

(الانفال-٢٩) يايها الذين امنو ان تتقو الله يجعلكم فرقانا

" হে ঈমানদারগন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার মানদন্ড দান করবেন।

(সুরা-৮, আনফার-২৯)

(৫) সংকট থেকে উদ্ধার এবং অভাবিত রিযক দান করবেন।

(২০-الطلاق) -ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب

"যে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে সংকট থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে অভাবিত রিযক দান করবেন। সুরা-৬৫, তালাক-২০)

(৬) আল্লাহর অলী ও বন্ধু হওয়া যায়ঃ

(৩৪-الانفال) -إن او لياءه الا المتقون

"নিশ্চই মুত্তাকী ছাড়া কেহ তার বন্ধু নয়।" (সূরা আনফাল-৩৪)

(৭) আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়ঃ

(৭৬-العمران) -فان الله يحب المتقين

"আর নিশ্চই আল্লাহ মোত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।"

(সুরা-৩, আল-ইমরান-৭৬)

(৮) আল্লাহর সাহচর্য লাভ করা যায়:

(১৯৪-البقرة) -و اتقو الله واعلمو ان الله مع المتقين

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, নিশ্চই আল্লাহ মোত্তাকীদের সাথে আছেন।"

(সুরা-২, বাকারা-১৯৪)

(৯) মোত্তাকীর আমল কবুল হয়ঃ

(৫৭-المائدة) إنما يتقبل الله من المتقين

"আল্লাহ অবশ্যই মোত্তাকীদের আমল কবুল করেন।"

(সুরা-৫, মায়েদা-৫৭)

(১০) দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কোন ভয় ভীতি নেইঃ

(৩৫-الاعراف) فمن اتقي واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

"যারা তাকওয়া অর্জন করে ও নিজের আচার আচরণকে সংশোধন করে, তাদের কোন ভয়- ভীতি ও পেরেশানী নেই।" (সুরা-৭, আরাফ-৩৫)

(১১) গুনাহ মাফ ও বিশাল পুরস্কার দেয়া হবেঃ

(৫-الطلاق) -و من يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له اجرا

"যে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করবেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।" (সুরা-৬৫, তালাক-৫)

(১২) তাকওয়া উত্তম সম্বলঃ-

(১৯৭-البقرة) -و تزودو فان خير الزاد التقوى

"তোমরা সম্বল সংগ্রহ কর। তবে তাকওয়াই হলো উত্তম সম্বল।" (সুরা-২, বাকারা-১৯৭)

(১৩) মোত্তাকী আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিতঃ

(১৩-الحجرات) -إن اكرمكم عند الله اتقاكم

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যাক্তিই উত্তম আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত যে অধিকতর তাকওয়ার অনুসারী।" (সুরা-৪৯,হুজরাহ-১৩)

(১৪) আল্লাহ মুমিন মোত্তাকীকে নাযাত দেনঃ

(১৮-حم السجدة) – ونجينا الذين أمنو و كانوا يتقون

"যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে আমরা তাদেরকে নাযাত দিয়েছি।" (সুরা-৪১,হামীম আস সেজদা-১৮)

(১৫) "তাকওয়া অবলম্বন কারীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ ঃ

(৬৩-৬৪-يونس) -الذين امنو و كانوا يتقون- لهم البشرى في الحيوة الدنيا و في الاخرة

"যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে

সুসংবাদ।" (সুরা-১০, ইউনুস-৬৩-৬৪)

* তাকওয়া অবলম্বনের ফলে আখিরাত তথা পরকালে নিম্মোক্ত ৭টি ফায়দাঃ

(১) মোত্তাকীরা বেহেশত লাভ করবে:

(৫১-৫২-الدخان) -إن المتقين في مقام امنن- في جنت و عيون

“নিশ্চই মোত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে, জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করবে।’’

(সুরা-৪৪, দুখান-৫১-৫২)

(২) মোত্তাকীদেরকে দলে দলে বেহেশতে নেয়া হবেঃ

وسيق الذين التقوا ربهم إلي الجنة زمرا- (الزمر- ٧٣)

“যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নেয়ে যাওয়া হবে।’’ (সুরা-৯, যুমার-৭৩)

(৩) মোত্তাকীরা আল্লাহর প্রতিনিধি দলের মর্যাদা পাবেঃ

يوم نحشر المتقين إلي الرحمن وفد- (مريم-৮৫)

“সেদিন মোত্তাকীদেরকে দয়ালু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে উঠানো হবে।’’

(সুরা-১৯,মরিয়ম-৮৫)

(৪) মোত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে আসমান- যমেিনর সমান প্রশস্ত জান্নাতঃ

و سارعو إلي مغفرة من ربكم و جنت عرضها السموت والرض اعد للمتقين – (العمران-১৩৩)

“তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুতগামী হও; যার প্রশস্ততা হলো আসমান-যমিনের সমান ; এটা মোত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।’’

(সুরা-৩, আল-ইমরান-১৩৩)

(৫) মোত্তাকীরা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকবেঃ

إن المتقين في جنت و نهر – في مقعد صدق عند مليك مقتدر- (القمر-৫৪–৫৫)

"মোত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও নহরে, সত্যের আসনে, সর্বাধিপতি শাহানশাহের সান্নিধ্যে।"

(সুরা–৫৪, কামার–৫৪–৫৫)

(৬) আল্লাহ মোত্তাকীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।

ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا- مريم-৭২)

"অতঃপর আমি মোত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখান থেকে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।" (সুরা–১৯, মরিয়ম–৭২)

(৭) মোত্তাকীদের ছাড়া কেয়ামতের দিন অন্য সকল বন্ধু শত্র"তে পরিণত হবেঃ

الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين- (الزخرف-৬৭)

"মোত্তাকীদের ছাড়া ঐ দিন সকল বন্ধু শত্র"তে পরিণত হবে।" (সুরা–৩৩, যুখরুফ–৬৭)

এ হলো তাকওয়ার কিছু উপকারীতা ও ফায়দা। যেগুলো নগদ এই দুনিয়াতে এবং পরকালে পাওয়া যাবে। কুরআন এবং হাদিছে তাকওয়ার আরো বহু পুরস্কারের কথা উল্লেখ আছে। তাই সবারই তাকওয়া অর্জনে আপ্রাণ চেষ্ট করা উচিত।

[২] এতে বুঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার নামই হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন। আয়াতের শেষে মুসলিম না হয়ে যেন কারও মৃত্যু না হয় সেটার উপর জোর দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে ঈমানদারের অবস্থান হবে আশা-নিরাশার মধ্যে। সে একদিকে আল্লাহ্র রহমতের কথা স্মরণ করে নাজাতের আশা করবে, অপরদিকে আল্লাহ্র শাস্তির কথা স্মরণ করে জাহান্নামে যাওয়ার ভয় করবে। কিন্তু মৃত্যুর সময় তাকে আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা নিয়েই মরতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ সম্পর্কে সু ধারণা না নিয়ে মারা না যায়" [মুসলিম: ২৮৭৭] অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার আশা থাকবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন।

(وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ)

অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক যাতে মৃত্যু ইসলামের উপরেই হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের প্রত্যেকে যেন আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভাল ধারণা নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। (মুসনাদ আহমাদ হা: ১৪১২৫, সহীহ)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত করে ধর[১] এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[২] তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।

[১] আল্লাহকে ভয় করার কথা বলার পর 'তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধর'এর আদেশ দিয়ে এ কথা পরিষ্কার করে দিলেন যে, মুক্তিও রয়েছে এই দুই মূল নীতির মধ্যে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে ও থাকতে পারে এই মূল নীতিরই ভিত্তিতে।

আল্লাহ্‌র রজ্জু বলতে তাঁর দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনকে রজ্জুর সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, এটি এমন একটি সম্পর্ক, যা একদিকে আল্লাহর সাথে ঈমানদারদের সম্পর্ক জুড়ে দেয় এবং অন্যদিকে সমস্ত ঈমানদারদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে এক জামায়াত বদ্ধ করে। এই রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার মানে হচ্ছে, মুসলমানরা "দ্বীন"-কেই আসল গুরুত্বের অধিকারী মনে করবে, তার ব্যাপারেই আগ্রহ পোষণ করবে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে এবং তারই খেদমত করার জন্য পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানেই মুসলমানরা দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে এবং তাদের সমগ্র দৃষ্টি ও আগ্রহ ছোটখাট ও খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে সেখানেই অনিবার্যভাবে তাদের মধ্যে সে এই প্রকারের দলাদলি ও মতবিরোধ দেখা দেবে, যা ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীর উম্মাতদেরকে তাদের আসল জীবন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনার আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল।

ইসলামের আগমনের পূর্বে আরববাসীরা যেসব ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ এবং রাতদিন মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে সমগ্র আরব জাতিই ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হওয়া থেকে ইসলামই তাদেরকে রক্ষা করেছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার তিন চার বছর আগেই মদীনার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের এ জীবন্ত অবদান তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা দেখছিলঃ আওস ও খাযরাজ দু'টি গোত্রে বছরের পর বছর থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। তারা ছিল পরস্পরের রক্ত পিপাসু। ইসলামের বদৌলতে তারা পরস্পর মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই গোত্র দু'টি মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের সাথে এমন নজীর বিহীন ত্যাগ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করছিল, যা সাধারণত একই পরিবারের লোকদের নিজেদের মধ্যে করতে দেখা যায় না।

অর্থাৎ যদি তোমাদের সত্যিকার চোখ থেকে থাকে, তাহলে এই আলামতগুলো দেখে তোমরা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারবে, কিসে তোমাদের কল্যাণ-এই দ্বীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার মধ্যে, না একে পরিত্যাগ করে আবার তোমাদের সেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মধ্যে? তোমাদের আসল কল্যাণকামী কে-আল্লাহ ও তাঁর রসূল না সেই ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিক, যারা তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে?

[২] وَلاَ تَفَرَّقُوا "পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" এর মাধ্যমে দলে দলে বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, উল্লিখিত দু'টি মূল নীতি থেকে যদি তোমরা বিচ্যুত হয়ে পড়, তাহলে তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে তোমরা বিভক্ত হয়ে যাবে। বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার দৃশ্য আমাদের সামনেই রয়েছে। কুরআন ও হাদীস বোঝার এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিয়ে পারস্পরিক কিছু মতপার্থক্য থাকলেও তা কিন্তু দলে দলে বিভক্ত হওয়ার কারণ নয়। এ ধরনের বিরোধ তো সাহাবী ও তাবেঈনদের যুগেও ছিল, কিন্তু তাঁরা ফির্কাবন্দী সৃষ্টি করেননি এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েও যাননি। কারণ, তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সকলের আনুগত্য ও আকীদার মূল কেন্দ্র ছিল একটাই। আর তা হল, কুরআন এবং হাদীসে রসূল (সাঃ)। কিন্তু যখন ব্যক্তিত্বের নামে চিন্তা ও গবেষণা কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটল, তখন আনুগত্য ও আকীদার মূল কেন্দ্র পরিবর্তন হয়ে গেল। আপন আপন ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের উক্তি ও

মন্তব্যসমূহ প্রথম স্থান দখল করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উক্তিসমূহ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হল। আর এখান থেকেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা শুরু হল; যা দিনে দিনে বাড়তেই লাগল এবং বড় শক্তভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল।

(وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا)

আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার কথা বলার পর তার রশি সকলকে শক্তভাবে ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ কথা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দু'টি মূলনীতিতে মুক্তি নিহিত: ১. আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা। ২. সকলে দীনের ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকা। হাবলুল্লাহ হল পবিত্র কুরআন ও দীন ইসলাম। যদিও এছাড়া অনেক তাফসীর পাওয়া যায়। তবে এটাই সঠিক। (আয়সারুত তাফসীর ১/২৯৪)

(وَّلَا تَفَرَّقُوْا)

আল্লাহ তা'আলা জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। যারা দীনের মধ্যে মতভেদ, ফিরকাহ বা দল-উপদল সৃষ্টি করে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ)

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে (বিভিন্ন মতে) খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়।" (সূরা আন'আম ৬:১৫৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা'আলা তিন কাজে তোমাদের প্রতি খুশি হন, আর তিন কাজ অপছন্দ করেন। যে তিনটি কাজে খুশি হন তা হল:

১. তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

২. আল্লাহ তা'আলার রশিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং দলে দলে বিভক্ত হবে না।

৩. যারা তোমাদের দায়িত্বশীল হবে তাদের কল্যাণ কামনা করবে।

আর যে তিনটি কাজ তিনি অপছন্দ করেন তা হল–

১. অনর্থক কথা-বার্তা বলা।

২. সম্পদ নষ্ট করা এবং ৩. বেশি বেশি প্রশ্ন করা। (সহীহ মুসলিম হা: ৪৫৭৮, মুসনাদ আহমাদ: ৮৭৯৯)

অতএব ইসলামের নামে দল-উপদল সৃষ্টি না করে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে দেন। জাহিলী যুগে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী বিগ্রহ ও কঠিন শত্র"তা ছিল। অতঃপর যখন গোত্রদ্বয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারা পূর্বের সবকিছু ভুলে গিয়ে ভাই-ভাইয়ে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এই দিকে ইঙ্গিত করে বলেন:

(وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَۙ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۗ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ)

"তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন, এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন।" (সূরা আনফাল ৮:৬২-৬৩)

তাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তোমরা তো ছিলে জাহান্নামের কিনারে। তিনি ইসলামের প্রতি হিদায়াত দিয়ে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন।

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে আর এরাই সফলকাম।

আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা‘আলা এখানে মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে বলছেন, তোমাদের এমন একটি দল থাকা আবশ্যক যারা কুরআন ও সুন্নাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: خير বা কল্যাণ হল

اتباع القران وسنتي

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা। (সহীহ বুখারী হা: ৬৪৬৪, সহীহ মুসলিম হা: ২১৭১)

আবুল আলিয়া বলেন: কুরআনে যে সকল আয়াতে

امر بالمعروف

বা সৎ কাজের আদেশ এসেছে সেসকল সৎ কাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসলাম, আর যেখানে

نهي عن المنكر

বা অসৎ কাজ থেকে নিষেধের কথা এসেছে সে সকল অসৎ কাজ দ্বারা মূর্তি পূজা ও শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর, ১/ ৪৯৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজ প্রত্যক্ষ করবে, সে যেন তা হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। তাতে সক্ষম না হলে জবান দ্বারা প্রতিহত করবে, তাতেও সক্ষম না হলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। এটা সবচেয়ে দুর্বল ঈমান। (সহীহ মুসলিম হা: ৪৯, আবূ দাঊদ হা: ১১৪০, তিরমিযী হা: ২১৭৬)

যারা দীনের এ মহতী কাজে আত্মনিয়োগ করবে তারাই সফলকাম হবে।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের মত হতে নিষেধ করেছেন যারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। আর তারা হল ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা। কেউ কেউ বলেন, তারা হল বিদআতীরা। তবে প্রথম উক্তিটিই উত্তম। (আইসারুত তাফাসীর, ১/২৭৯, অত্র আয়াতের তাফসীর)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ইয়াহূদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছে, খ্রিস্টানরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ছাড়া। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কারা? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তারা হল এ সমস্ত লোক যারা আজ আমি ও আমার সাহাবাগণ যে আকীদাহ ও আমলের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (আবূ দাঊদ হা: ৪৫৯৬, ৪৫৯৭, তিরমিযী হা: ২৬৪০-৪১, ইবনু মাযাহ হা: ৩৯৯১, ৩৯৯৩, সহীহ)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কোন সুনির্দিষ্ট দলকে ফিরকাহ নাজীয়া বলে উল্লেখ করেননি। সে অনুযায়ী যে সকল মু’মিন-মুসলিম ব্যক্তিরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের আমল ও আকীদাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই ফিরকাহ নাজীয়া বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল।

যারা সত্য জানার পরেও দলে দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

কিয়ামতের দিন কতক ব্যক্তির চেহারা হবে উজ্জ্বল, ইবনু আব্বাস বলেন, তারা হল: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ। আর কতক ব্যক্তির চেহারা মলিন হবে। তিনি (রাঃ) বলেন, তারা হল: বিদ‘আতী ও যারা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। হাসান বসরী (রহঃ) বলেন: তারা হল মুনাফিক। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ২/১০০, ফাতহুল কাদীর, ১/৫০০)। সুতরাং দলে দলে বিভক্ত হবার কোন সুযোগ নেই। যারা দলে দলে বিভক্ত হবে তারা ইসলাম বহির্ভূত।

ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পূণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যে সব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লেখিত মারুফ তথা সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। ‘মারুফ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্ম সাধারণ্যে পরিচিত। তাই এগুলোকে ‘মারুফ’ বলা হয়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব অসৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত মুনকার’ এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে ‘ওয়াজিবাত’ অর্থাৎ জরুরী করণীয় কাজ ও ‘মা’আসী’ অর্থাৎ ‘গোনাহর কাজ’ -এর পরিবর্তে ‘মারুফ’ ও ‘মুনকার’ বলার রহস্য সম্ভবত এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন খারাপ কাজ দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। এটাই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘এর পরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও বাকী নেই। [মুসলিমঃ ৪৯, আবু দাউদঃ ১১৪০]

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা অচিরেই আল্লাহ

তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযিল করবেন। তারপর তোমরা অবশ্যই তাঁর কাছে দো'আ করবে, কিন্তু তোমাদের দোআ কবুল করা হবে না। [তিরমিযীঃ ২১৬৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৯১]

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক লোক জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কোন লোক সবচেয়ে বেশী ভাল? তিনি বললেনঃ সবচেয়ে ভাল লোক হল যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে, সৎকাজে আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৩১]

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. উম্মাতে মুহাম্মাদীর এমন একটি দল থাকা আবশ্যক যারা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে।

২. দলে দলে বিভক্ত হওয়া হারাম।

৩. কিয়ামাতের দিন বিদ'আতী ও যারা প্রবৃত্তি পূজারী তাদেরকে মলিন চেহারায় দেখা যাবে।

৪. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তারাই যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাগণ যে আকীদাহ ও আমালের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

৫. সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্যের মাপকাঠি নয় বরং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ-ই হলো সত্যের মাপকাঠি।